তবে এটুকু বুঝতে পারল, এইসব অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা থেকে তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

ফকিরের সঙ্গে তার সামান্যই পরিচয়। আলাপ মাত্র ক'দিনের। এইটুকু ঘনিষ্ঠতাতেই যে তাকে সাহায্য করার জন্য মিঞা এগিয়ে এসেছে, তার জন্য সদানন্দর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

সদানন্দ শান্তিপ্রিয় মানুষ। কোনও ঝামেলাতে জড়াতে ভালোবাসে না। পছন্দ করে না জটিলতা। তার কোনও ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও তাকে এই অঘটনটার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ঘোলা জলে মাছ ধরার ইচ্ছে হয়েছে কারও-র।

মনসুর মিঞাকে বিদায় জানিয়ে সদানন্দ জটিল পরিস্থিতিটা নিয়ে আকাশপাতাল ভাবতে থাকল। এমন আত্মীয়-বান্ধববর্জিত জায়গায় চাকরিটা কি তার না করলেই নয়?

... ...

বেশ ছিল সদানন্দর নিশ্চিন্ত নিস্তরঙ্গ জীবন। বেশ বলাটা বোধহয় শক্ত, তবে এতকাল পর্যন্ত ওর জীবনটা কেটে গিয়েছে নিরুত্তাপ, নিরুদ্বেগ। জটিলতা ছিল না। টেনশনের প্রশ্ন ওঠেনি। হঠাৎ কটা দিনে সদানন্দর যাপিত জীবনে দু'টো ঘটনার প্রভাবে সব কিছু বদল, হয়তো বা তছনছ হয়ে যাওয়ার পালা।

– কবে?

– আজ তো শুক্রবার। কাল বাদে পরশু।

– কেন, শনিবার তো হাফ ছুটি। কালকেই বা চলে এলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

– দেখি।

– দেখি ফেকি নয়। কাল বিকেলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। ও. কে.? রাতে এখানেই থাকছ। রোববার বিকেলের আগে ছুটি নেই। তৈরি হয়ে এস।

কথা বাড়ানোর সুযোগ ছিল না। সম্মতি জানিয়ে সদানন্দ রিসিভার রেখে দিল। ভেবে দেখল না, কত বড় কথাটা দেওয়া থাকল। বিশলাখির রাজবাড়িতে রাত্রিবাসের প্রতিশ্রুতি। সেটা যে দু'জনের পক্ষেই কতখানি ঝুঁকির, সেটা আমন্ত্রক এবং আমন্ত্রিত কেউই তলিয়ে দেখল না।

পরদিন স্কুলে একটা নাগাদ ঢং ঢং করে আওয়াজটা হতেই বহুকাল পর সদানন্দর মনে হল, এটা সত্যিই ছুটির ঘণ্টা। প্রতিদিন দুপুর একটায় টিফিনের ঘণ্টা পড়ে। দেড়টা থেকে ফের ক্লাস শুরু। শনিবার একটার সময় লম্বা ঘণ্টা বাজলেও সদানন্দ সেটাকে অন্যদিনের মতো টিফিনের ঘণ্টা বলেই মনে করে। কেন না, সে তো আর ছাত্রদের মতো হইহই করে দুপুরের রোদ মাথায় করে বাড়ির পথে ছুটতে পারে না। অন্য শিক্ষকের মতো ব্যাগ গুছিয়ে তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে চলে যাওয়ারও সুযোগ

কথা বাড়ানোর সুযোগ ছিল না। সম্মতি জানিয়ে সদানন্দ রিসিভার রেখে দিল। ভেবে দেখল না, কত বড় কথাটা দেওয়া থাকল। বিশলাখির রাজবাড়িতে রাত্রিবাসের প্রতিশ্রুতি। সেটা যে দু'জনের পক্ষেই কতখানি ঝুঁকির, সেটা আমন্ত্রক এবং আমন্ত্রিত কেউই তলিয়ে দেখল না

অমৃতার খোঁজ পাওয়ার পর থেকে এত বড় খুশির বিষয়টা সদানন্দ উপভোগ করতেই পারছে না। খুব চলে যেতে ইচ্ছে করছে ওর কাছে আবার। উদ্ভট কতগুলো জটিলতায় এমন ফেঁসে গিয়েছে যে ক'টা দিন দ্বীপচর থেকে বেরনোর ফুরসতই পাচ্ছে না। অমৃতার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি। সদানন্দর সেলফোন নেই। নির্বান্ধব একা মানুষ, কখনওই প্রয়োজন পড়েনি। স্কুলে হেডমাস্টারের টেবিলে টেলিফোন আছে, কিন্তু নীতিগত কারণে সদানন্দ সেটা নিজের কাজে কখনও ব্যবহার করে না।

অমৃতার কথামতো দু'টো হলঘরের প্ল্যান-এস্টিমেট করতে দিয়েছিল। রঘুনাথগঞ্জ পৌরসভার পরিচিত বাস্তুকার সেটা বানিয়ে দিয়েছেন। সেই কাগজপত্র সঙ্গে দিয়ে অমৃতার কাছে স্কুলের পক্ষ থেকে একটা লিখিত আবেদন জমা করার কথা।

পরের দিন স্কুলে টেলিফোন করল অমৃতা নিজেই। নম্বরটা গত রবিবার লিখে নিয়েছিল।

– কিগো! গিয়ে যে পাঁচ ছ'দিন খবর নেই। আবার ভুলে গেলে নাকি!

সামনে হেডক্লার্ক অবনী দত্ত বসে আছে কী একটা কাজে! অন্যের উপস্থিতিতে এ সব কথার যথাযথ জবাব দেওয়া মুশকিল। অস্বস্তিকর। যতটা সম্ভব সংযমের সঙ্গে সদানন্দ উত্তর দিল, কী যে বল না! প্ল্যান-এস্টিমেটটা রেডি না হওয়া পর্যন্ত যেতে পারছিলাম না।

– শুধু কাজের প্রয়োজনেই কি কথা? টেলিফোনটা তো টেবিলেই। একটু ডায়াল করতে এত কষ্ট?

– স্কুল থেকে ব্যক্তিগত কথা ...

– ধ্যাৎ, তুমিই তো কর্তা।

– দায়িত্বটা সে কারণেই বেশি। ঠিক আছে, দেখা করছি।

পায় না। সুযোগ ঠিক নয়, নিজেই যেতে চায় না। যাবে কোথায়! স্কুলে বসেই প্রশাসনিক কাজ করে। হারাধন তো থাকেই। কোনওদিন হেডক্লার্ক অবনীবাবু কিংবা টাইপিস্ট বরুণও সঙ্গে থেকে সহযোগিতা করে হেডমাস্টারকে। দরকার পড়লে ক্যাশিয়ার ক্লার্ক সুনীল দাসকেও আটকে রাখে সদানন্দ। কেউ আপত্তি করে না।

আজ সকলের ছুটি। খুশি সবাই। হেডমাস্টারও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছেন। কেউ জানে না, আজ তার পৌনে দু'টোয় ট্রেন ধরার তাড়া। সদানন্দ স্বাভাবিক কারণে হারাধন ছাড়া কাউকে বলেনি, সে বাইরে যাচ্ছে কোথাও।

গঙ্গা পেরিয়ে মাইলখানেক ভ্যানরিকশায় গেলে নয়াগ্রাম হল্ট স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেন ধরল সদানন্দ। আজিমগঞ্জ সোয়া ঘণ্টার জার্নি। সদরঘাট পেরিয়ে জিয়াগঞ্জ। সেখানে রিকশা নিয়ে বিশলাখিতে যেতে হয়। দ্বীপচর থেকে দূরত্ব এমন কিছু নয়। পঞ্চাশ কিংবা একান্ন-বাহান্ন কিলোমিটার। কিন্তু নানারকম যানবাহনে যাতায়াত। দু'বার নৌকা পেরোতেই মিনিট পনেরো করে আধঘণ্টা বেরিয়ে যায়।

যখন সদানন্দ বিশলাখির রাজবাড়িতে ঢুকল তখনও সন্ধ্যা নামেনি। সূর্য পশ্চিম আকাশে। বৈশাখের মাঝামাঝি। প্রায় প্রতি অপরাহ্নে আজকাল ঝড়বৃষ্টি হোক না হোক পশ্চিমে কালো মেঘের দাপাদাপি। আজকে অন্যরকম। আকাশ পরিচ্ছন্ন। শুক্লা দ্বাদশীর বিশাল চাঁদ সন্ধ্যার আগে উঁকি দিয়েছে পুব আকাশে। বড় মনোরম পরিবেশ। গোধূলির নরম রোদ্দুর এবং সান্ধ্য-জ্যোৎস্নার এমন সম্পৃক্তি চোখে পড়ে কদাচিৎ।

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ সোমনাথ

রসেবশে

বিপ্রলাপ

তপতী ঘোষ

রতনবাবু পড়ার টেবিলে খুব মনোযোগ দিয়ে লেখালেখির কাজ করছেন।

স্ত্রী মল্লিকা খুব বিরক্তি সহকারে বলে – রাত কত হল খেয়াল আছে?

– বেশি রাত হয়নি, এগারোটা বাজে।

– শোবে না? আমি খুব ক্লান্ত, সারাদিন বিশ্রাম হয় না।

– তুমি ঘুমোও। এখনও আমার অনেক লেখা বাকি আছে, সবই পুজোসংখ্যার লেখা। তুমি ঘুমোও লক্ষ্মীটি সোনা আমার।

– আ মরণ! আমি আবার সোনা হলাম কবে থেকে? রাতদিন তো আমাকে দাঁতের উপর রাখো, সবেতেই খুঁত ধরো, এখন লক্ষ্মী, সোনা – গা জ্বলে যায় শুনলে।

– ওগো তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, আমি তোমাকে সময় দিতে পারি না এটা আমার দোষ। কী করব বলো, আমি যে কবিতা ভালোবাসি, আমার চিন্তায়, কথায়, শয়নে, স্বপনে শুধু কবিতা আর কবিতা।

– অ্যাই মেরেছে, ওটা আবার কে? শেষ বয়সে এসে একি ভীমরতি হল তোমার।

– আরে না না, তুমি যা ভাবছ তা না। আমি কবিতা লিখি।

– কবিতা কে? তাকে নিয়ে অত লেখার কী আছে? প্রেমপত্র নাকি? সত্যি কথা বলো, তা না হলে আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। দেখি খাতাটা কী লিখেছ, যদি বেতাল কিছু দেখি সব ছিঁড়ে ফেলব।

– কি আজে বাজে বকছ। আগে ভালো করে দেখো তারপর বোলো। এই বয়সে অত উত্তেজিত হতে

নেই,
শরীর খারাপ
হবে। শোনো এই বয়সে
কি আর প্রেমপিরীত হয়। ও শুধু গল্পে
আর কবিতায় হয়।

– আগে দেখি তোমার লেখাটা, কী লিখেছ –
অন্ধকার ছুঁয়েছিল অনাঘ্রাত বুক।
সারারাত তাথৈ নৃত্য
বোল তোলে শরীরে ...

ছিঃ ছিঃ এটা কি কবিতা হল? সত্যি করে বলো কোথায় সারা রাত তাথৈ নৃত্য করেছ? হায় ভগবান শেষ বয়সে আমার কপালে এই ছিল।

– আরে ধুর। বোঝে না মুখ্যু মেয়ে মানুষ। আধুনিক কবিতা এইরকম হয়। একটু পড়াশোনা করো, বুঝতে পারবে।

– নিকুচি করেছে তোমাদের আধুনিক কবিতা। কবিতা হবে ছন্দোবদ্ধ, মার্জিত হবে ভাষা, ঠিক থাকবে মাত্রা, তাল। যা একবার পড়লে মনে গেঁথে যাবে।

– শোন মল্লিকা, আধুনিক কবিতায় ও সব মানলে হবে না। এখন কবিতা সহজে বোধগম্য হলে, অন্ত্যমিল থাকলে লোকে পাত্তাই দেবে না, এখন যত মানে না বুঝবে, দু'চারটে কঠিন কঠিন শব্দ জুড়ে দেব ততই কবিতার কদর বুঝলে। এই দ্যাখো, একটা কবিতা পড়।

– দেখি পত্রিকাটা কবিতাটা পড়ি –
আমার উদ্ধত যৌবনের –
শিরা উপশিরায় উষ্ণ রক্তপ্রবাহ।
রাত গভীর হয়, শরীর মাদকতায়
মত্ত হয়ে উঠি। দু'হাতে ..

আরে রাম-রাম আর পড়তে পারব না, কান মাথা গরম হয়ে গেল। যা বলতে চাইছে কবি – সেটা তো চিরন্তন। লিখে অশ্লীলতা প্রকাশ করার কী আছে। তোমরা কবিরা কি পাগল? এইসব লিখে তোমরা কি পয়সা পাও?

– না না ছোট পত্রিকা পয়সা দেবে কোথা থেকে? ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখতে কার না ইচ্ছে করে বলো?

– পয়সা পাও না, খালি পয়সা নষ্ট করো, সময় নষ্ট করো। আমার জন্য তোমার কোনও সময় নেই। আমি পয়সা চাইলে তখন তোমার মনে হয় সব অপচয়। উঃ রে আমার সোয়ামী রে, আমি যদি এই কবিতার ভূত তোমার ঘাড় থেকে না নামিয়েছি তবে আমার নাম মল্লিকা নয়।

– আরে করো কি? খাতা দাও, প্লিজ ছিঁড়ো না, ওটা আমার কলজের কোয়া, মল্লিকা থামো, ছিঁড়ো না।

– কিছুতেই থামব না, আজ খাতা সুদ্ধু তোমাকে আমি ছিঁড়ে ফেলব। আজ সব বাদ দিয়ে তুমি আমাকে সময় দেবে।

– বেশ বেশ তাই হবে, খাতাটা দাও। এখন আর লিখব না, চলো শোবে চলো।

পুঞ্জীভূত জমা অভিমান অশ্রুধারায় নেমে আসে। মান ভাঙাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন রতনবাবু। অনেক পরিশ্রম করে শান্ত করেন স্ত্রীকে। শেষ রাতে সুধাময়ী দেবীর নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রতনবাবু নিশ্চিন্ত হলেন – যাক বাব্বা বাঁচা গেল, অনেক কষ্টে শান্ত করেছি গিন্নিকে। বোঝে না কিছু, অনর্থক বিবাদ করে খালি। আরে বাবা, কবিতা হল অন্তরে লালিত এক না দেখা সুখ, মনের গোপন অভিসার, আধো ছায়া – আধো আলোয় ঢাকা এর ভাষা একি সবার জন্য? অত নিয়ম মেনে কবিতা লিখলে আর আধুনিক কবিই তৈরি হবে না। অত মানে বোঝার কি আছে, পাঠক যেমন খুশি তার মতো করে বুঝে নিক। তবেই তো কবিতার দাম বাড়বে। বেশ লিখেছিলাম দিল তালটা কেটে। আবার প্রথম থেকে ভাবতে হবে। দেখি চেষ্টা করে।

অন্ধকার ছুঁয়েছিল অনাঘ্রাত বুক
সারারাত তাথৈ নৃত্য
বোল তোলে শরীরে
শেষ রাতে ধ্রুবতারা উঁকি দিয়ে যায়
নৈঃশব্দ্য খুন হয় অতি সন্তর্পণে।
অন্ধকার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়
এখানে ওখানে।
এক ফালি বাঁকা চাঁদ মুখ টিপে হেসে
বিদায় নেয় শেষ রাতে।

অঙ্কন ঃ অভি